কৃত্রিম মেধা আর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বাড়িয়ে তুলছে আর্থিক অসাম্য

‘শেষে কি নিজেকে খাবে?’

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

আপনি নিউ ইয়র্ককে কী বলবেন?” সত্যজিৎ রায়ের *আগন্তুক* (১৯৯১) ছবিতে প্রশ্নটি করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর বাদে দেশে ফিরে আসা মনোমোহন মিত্র। কৌতুকশিল্পী রঞ্জন রক্ষিতের “উরি বাবা! ও তো জাঁদরেল শহর...” উত্তর শুনে মনোমোহন একটু থেমে বলেছিলেন, “মেন থারাফেয়ার... পেভমেন্ট... ফ্যামিলির পর ফ্যামিলি বসে আছে ব্যাজার মুখ নিয়ে। সামনে প্ল্যাকার্ড—উই আর হোমলেস।” কয়েক সেকেন্ডের এই কথোপকথনে গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকের আমেরিকার অর্থনৈতিক অসাম্যের করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছিল আমাদের চোখের সামনে।

তিন দশক কেটে গিয়েছে তার পর। এবং, আমেরিকার অসাম্যের ছবিটা হয়ে উঠেছে আরও ভয়াবহ। ১৯৮৯-এ আমেরিকার ধনীতম এক শতাংশের কব্জায় ছিল ১০% জাতীয় সম্পদ, যা ২০২১-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশে। উল্টো দিকে, ১৯৮৯-এ অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের নীচের ৫০ শতাংশের হাতে ছিল জাতীয় সম্পদের মাত্র ১.৬%; ২০২১-এ হারটি ২.১%।

আমেরিকায় এই তীব্র অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধির নেপথ্য কারণ কি আস্তে আস্তে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গুরুত্বহীন হয়ে পড়া? ২০০৮-এর অর্থনৈতিক মন্দা? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে হওয়া লাভ বিত্তশালীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠা? না কি দেশের চাকরি বিদেশে ‘অফশোর’ করে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া? এমআইটির অধ্যাপক ড্যারন অ্যাসেমোগ্‌লু এবং বস্টন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পাসকুল রেস্ট্রেপো একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দাবি করেছেন, আমেরিকায় অসাম্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ উপরোক্ত কারণগুলির একটিও নয়। তাঁদের মতে, আমেরিকায় অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ গত তিন দশক ধরে স্বয়ংক্রিয়তার বা ‘অটোমেশান’-এর লাগাতার উত্থান।

স্বয়ংক্রিয়তা বলতে বোঝায় এক প্রকার প্রযুক্তিকে, যার দ্বারা কোনও প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ন্যূনতম মানবসহায়তায় সঞ্চালিত হয়। স্বয়ংক্রিয়তার মেরুদণ্ড— আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধা ও আধুনিক তথ্য বিজ্ঞান। ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে শুরু করে খাদ্য শিল্প, শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য— আমেরিকার মতো উন্নত দেশে স্বয়ংক্রিয়তা এবং রোবটিক্সের বিপুল প্রয়োগ আজ সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধির জন্য স্বয়ংক্রিয়তার এই বিস্ফারকে দায়ী করা যায় কী ভাবে?

অ্যাসেমোগ্‌লু এবং রেস্ট্রেপো গত তিন-চার দশকের শ্রম বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, স্বয়ংক্রিয়তার উত্থানের ফলে আমেরিকা জুড়ে অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বিপুল ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তার কারণ, এঁরা যে ধরনের কাজ করতে পারেন— যেগুলিকে সাধারণ ভাবে ‘ব্লু-কলার্ড জবস’ এবং ‘ক্লারিক্যাল জবস’ বলা হয়ে থাকে— সেগুলি খুব সহজেই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে করে ফেলা যায়। যে-হেতু স্বয়ংক্রিয়তার উত্থানের ফলে এঁদের কর্মসংস্থান কমেছে হুহু করে, অথচ শ্রম বাজারে অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পায়নি— তাই তাঁদের অনেকেই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্য দিকে, দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত শ্রমিক যাঁরা, তাঁদের কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হয়নি, কারণ তাঁরা যে ধরনের কাজে যুক্ত, সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সহজ নয়। তাই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের কম বেতনে চাকরি করারও প্রয়োজন হয়নি। ফলত, গত তিন দশকে এঁদের গড় আয় কমেনি, বরং বেড়েছে।

অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকরা সাধারণত অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের নীচের দিকে অবস্থান করেন (আপেক্ষিক ভাবে দরিদ্র)। আর দক্ষ এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রমিকদের অবস্থান অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের উপরের দিকে (আপেক্ষিক ভাবে ধনী)। তাই বলা যায় যে, গত তিন দশক ধরে আমেরিকায় স্বয়ংক্রিয়তা অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের নীচের দিকে অবস্থানরতদের অবস্থা আরও সঙ্গিন করে এবং অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের উপরের দিকে অবস্থানরতদের ফুলে-ফেঁপে উঠতে সাহায্য করে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই অবধি পড়ে মনে হতেই পারে যে, আট হাজার মাইল দূরের দেশে স্বয়ংক্রিয়তায় উত্থান হল কি না, তা অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি করল কি না, এ সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর আদৌ কোনও কারণ আছে কি? আছে। সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্রে অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি দেখিয়েছেন যে, আয়ের নিরিখে ভারতে অসাম্য আজ গত ৯৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অক্সফ্যাম-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে যে, ভারত ক্রমেই কেবলমাত্র ধনীদের দেশ হয়ে উঠছে— ২০১২ থেকে ২০২১ অবধি দেশে মোট যত সম্পদ উৎপন্ন হয়েছে, তার চল্লিশ শতাংশেরও বেশি কুক্ষিগত হয়েছে ধনীতম এক শতাংশ মানুষের; আর দরিদ্রতম ৫০% মানুষের ভাগে পড়েছে মাত্র তিন শতাংশ সম্পদ। পাশাপাশি, মাত্র কয়েক দিন আগে জানা গেল, গত আট-দশ বছরের মধ্যে ভারতে এই মুহূর্তে বেকারত্বের হার সর্বাধিক। এই পরিস্থিতিতে চোখে পড়ল একটি সংবাদ-শিরোনাম—‘অর্থ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভারত দুর্বার গতিতে স্বয়ংক্রিয়তা গ্রহণ করছে’। ভারতের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আমাদের দেশে ইদানীং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্বয়ংক্রিয়তার প্রয়োগ ঘটছে, সেটা চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। আজকাল এক বারের জন্য ব্যাঙ্কে না গিয়েও আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন কেবল মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, দোরগোড়ায় পৌঁছনো খাবার মনপসন্দ না হলে অভিযোগ জানাতে পারেন ‘চ্যাটবট’-এর কাছে। যে স্বয়ংক্রিয়তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছি, সত্যিই যদি ‘দুর্বার গতিতে’ তা ভারতের সমস্ত শিল্প ও পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা অবশ্যই যথেষ্ট আশঙ্কার। তার কারণ, স্বয়ংক্রিয়তা যাঁদের সবচেয়ে বিপদে ফেলে, সেই অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ ও স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকরাই ভারতের শ্রমশক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। স্বয়ংক্রিয়তার উত্থানের ফলে যদি এঁরা কাজ হারান কিংবা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন, তা হলে এমনিতেই যে ভারতীয় অর্থনীতি অসাম্য ও বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত, সেই অর্থনীতির কোমর ভাঙার উপক্রম হবে না— এ কথা জোর দিয়ে বলা মুশকিল।

অতঃ কিম্? স্বয়ংক্রিয়তার করালগ্রাস যে আমরা এড়াতে পারব না, সেটা প্রশ্নাতীত রকম পরিষ্কার। কিন্তু চেষ্টা করলে কয়েকটা জিনিস করা যেতে পারে যা স্বয়ংক্রিয়তার নেতিবাচক দিকগুলিকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যেমন, শ্রমশক্তির একটা বড় অংশকে যাতে উচ্চশিক্ষার আওতায় আনা যায়, যাতে দক্ষ করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে সরকারের অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া উচিত। আজ যিনি স্বল্পশিক্ষিত এবং অদক্ষ বলে ওয়েল্ডিং-এর কাজ করেন, স্বয়ংক্রিয়তার উত্থান তাঁকে বিপদে ফেলবেই। কিন্তু কাল যদি সেই মানুষটিই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে ‘ডিজ়াইনার’ হয়ে ওঠেন, তা হলে স্বয়ংক্রিয়তার উত্থানের ফলে তাঁর বিপদের ভয় কম, কারণ ওয়েল্ডারের কাজ স্বয়ংক্রিয় করা গেলেও, ডিজ়াইনারের কাজ স্বয়ংক্রিয় করা মুশকিল। সরকার নানা সময় নানা প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ব্যবসাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করে (যেমন ‘স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া’)। এই ব্যবসাগুলির বেশির ভাগই যাতে পুরোপরি স্বয়ংক্রিয়তা-নির্ভর না হয়, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (১৮১৮) উপন্যাসে মেরি শেলি লিখেছিলেন এক উন্মাদ বিজ্ঞানীর কথা, যিনি এক কৃত্রিম মানুষকে নির্মাণ করেছিলেন মৃতদেহের টুকরো ব্যবহার করে। প্রথমে কৃত্রিম মানুষটি ভালবাসা এবং স্নেহের কাঙাল হলেও, শেষে তারই নির্মাতার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে। স্বয়ংক্রিয়তা যেন সেই কৃত্রিম মানুষ, যাকে বহু যুগ ধরে যত্ন করে নির্মাণ করেছি আমরা। এখন সে প্রাণ পেয়ে যখন আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়ানোটাই আমাদের এ সময়ের প্রধান কর্তব্য— তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ আছে কি?

অর্থনীতি বিভাগ, শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়